গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৪৩ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ জুন ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার শিকার হবেন না, সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখুন

বিজেপির মুখপাত্রদের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের দ্বারা নিযুক্ত দলের দুই জাতীয় মুখপাত্র চরম নিন্দনীয় এবং ক্ষমার অযোগ্য যে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন তা তাঁদের ব্যক্তিগতও নয়, আকস্মিকও নয়। এটা জনসাধারণকে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি ও দাঙ্গায় উস্কানি দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক তৈরির হীন প্রচেষ্টা। সংঘ পরিবার এবং বিজেপি তাদের নির্বাচনী স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন ধরে হিন্দুত্বের 'গৌরবগাথা' প্রচার এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা সৃষ্টির যে চেষ্টা চালাচ্ছে এটা তারই ফসল। উপরন্তু এর মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে ধর্মান্ধ হিন্দু মৌলবাদকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একই সাথে এর দ্বারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করে তাদের ইসলামিক মৌলবাদের শিকারে পরিণত করার অপচেষ্টা চলছে, যাতে তা বিজেপি-সংঘ পরিবারের পক্ষে হিন্দু মৌলবাদকে আরও শক্তিশালী করার কাজে সহায়ক হয়। বর্তমানে, যাঁরা এখানে সেখানে বিচ্ছিন্ন ও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটাচ্ছেন তাঁরা কার্যত বিজেপি-সংঘ পরিবারের এই ষড়যন্ত্রকেই সাহায্য করছেন।

লক্ষণীয়, যে সব ইসলামিক দেশের সঙ্গে ভারতীয় বহুজাতিক পুঁজিমালিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থ জড়িত এবং

চারের পাতায় দেখুন

যে আইন বাঁচার অধিকার কেড়ে নেয় তাকে ভাঙো

২৯ জুন গণ আইন অমান্য

ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, শাসকদলের নেতা-মন্ত্রী-আমলাদের দুর্নীতি মানুষের জীবন জেরবার করে তুলছে। তিতিবিরক্ত মানুষ এ সবের হাত থেকে মুক্তি চাইছে। সর্বত্র মানুষ দলের কর্মীদের বলছেন, একটা কিছু করুন। আর তো পারা যায় না। আর কোনও দল তো কিছু করবে না, করলে আপনারাই করবেন। মানুষের এই আকুতিকে ভাষা দিতে উদ্যোগী হয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। জনজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি নিয়ে এস ইউ সি আই (সি), কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। সেই আন্দোলনেরই এক পর্যায়ে জনসাধারণের দাবি মতো আন্দোলনকে আরও তীব্র করতে, দল ডাক দিয়েছে ২৯ জুন গণ আইন-অমান্যের।

তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় দফার সরকারের এক বছর পার না হতেই তার গা থেকে দুর্নীতি দলবাজি স্বজনপোষণের পচা দুর্গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে। একের পর এক নেতা-মন্ত্রীর নাম জড়াচ্ছে দুর্নীতির সাথে। শিক্ষক নিয়োগ কিংবা নার্সিং, নিয়োগের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বজনপোষণ, জালিয়াতি, কোটি কোটি টাকার ঘুষ দুর্নীতি প্রকাশ হয়ে পড়ছে। মানুষ সিপিএমকে সরিয়ে তৃণমূলকে এনেছিল কি এসবের জন্য? পূর্বতন সিপিএম সরকারের দলবাজি, দুর্নীতি, স্বজনপোষণে তিতিবিরক্ত হয়েই মানুষ তৃণমূল সরকারকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিল। মানুষের সে আশার সঙ্গে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আজ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, যে দল যেখানে ক্ষমতায় বসছে, কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম, তৃণমূল বা অন্য কোনও দল, দুর্নীতির পাঁকে সবার মাথা পর্যন্ত ডুবছে। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যখন আজ ভেবেই পাচ্ছেন না, তাদের সংসার চলবে কী করে, ছেলেমেয়েকে মানুষ করবেন কী করে, তাদের পড়াশুনা হবে কী করে, পরিবারের চিকিৎসা হবে কী করে, তখন দেখছেন একদল সরকারি নেতা-মন্ত্রী-আমলা, তাদের পারিষদবর্গ জনগণের সম্পত্তি লুঠের টাকায় কী ভাবে বিলাস-বৈভবের জীবনযাপন করছে, তাঁদের দোতলার উপর তিনতলা, তিনতলার উপর চারতলা উঠছে, ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

দুয়ের পাতায় দেখুন

আইন অমান্য সফল করার আহ্বান নিয়ে ৬ জুন জয়নগরে মিছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য এবং কমরেডস দেবাশীষ রায়, নন্দ কুণ্ডু, তরুণ নস্কর, সৌরভ মুখার্জী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

আচার্য হোন শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়

মত বিশিষ্টজনদের

মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিতে ১৩ জুন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির আহ্বানে কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগর মূর্তির পাদদেশে শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্টজনদের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স একাডেমির বিজ্ঞানী অধ্যাপক ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক অমিতাভ দত্ত, অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সম্পাদক অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, বিশ্বভারতীর অধ্যাপক বিজয় দলুই, অধ্যাপক মানস জানা, অধ্যাপক মনোজ গুহ সহ বিশিষ্ট শিক্ষক ও শিক্ষাবিদরা। বক্তারা বলেন, কেন্দ্রের শাসক দল নাকি রাজ্যের শাসক দল কে শিক্ষাঙ্গনের দখল নেবে আজ তারই প্রতিযোগিতা চলছে। শিক্ষার স্বাধিকার রক্ষা হল কি না তা নিয়ে এদের কোনও মাথাব্যথা নেই। নবজাগরণের যুগে শিক্ষাকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও ধর্মান্ধদের কবল থেকে মুক্ত করে গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক ও ধর্মনিরপেক্ষ করবার জন্য যে ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধিকার রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছিল, যে লড়াইয়ে পথপ্রদর্শক ছিলেন বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিরা, তাকে পদদলিত করে আজ ন্যক্কারজনক ভাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা শিক্ষাঙ্গনের অধিকার দখলের প্রতিযোগিতা করছে। এর ফলে গণতান্ত্রিক শিক্ষার সমাধি রচনা হবে, তার সাথে ব্যাপকভাবে বাড়বে শিক্ষার রাজনীতিকরণ এবং চরম দুর্নীতি। সভার সভাপতি প্রাক্তন উপাচার্য চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী বলেন, আজ তারা বলছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার যা করছে তা জনগণের রায় মেনেই। একদিন এই জনগণই তাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়বে এবং এই নীতিকে পরাস্ত করবে। ফলে আমাদের লড়াই চলবে।

আটের পাতায় দেখুন

২৯ জুন আইন অমান্য

একের পাতার পর

কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকে দেশের মানুষ ক্ষমতায় বসিয়েছিল কংগ্রেস সরকারের দুর্নীতি এবং অপদার্থতার হাত থেকে রেহাই পেতে। অথচ বিজেপি সরকারও ক্ষমতায় বসেই একের পর এক জনবিরোধী পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। তারা প্রথম যে কাজটি করেছে তা হল, রাষ্ট্রায়ত্ত সমস্ত শিল্প-কারখানা-সম্পদ-সম্পত্তি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিয়েছে— রেল তেল গ্যাস ব্যাঙ্ক বিমা বন্দর প্রভৃতি সব কিছু। ভোজ্য তেল, ওষুধ, রান্নার গ্যাস, জ্বালানি তেল সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়িয়েছে অবাধে। পুঁজিপতিরা জনগণের সম্পত্তি নির্বিচারে লুঠ করে চলেছে। ব্যাঙ্কগুলি থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ করছে পুঁজিপতিরা, যা দেশের জনগণের কষ্টার্জিত টাকা। ধনী-দরিদ্রে বৈষম্য সমস্ত সীমা ছাড়িছে। করোনা অতিমারির সময়ে যখন হাজার হাজার মানুষ সামান্য অক্সিজেনের অভাবে মারা যাচ্ছে তখন দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের মুনাফা আকাশ ছুঁয়েছে। দেশের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে, তারা যখন করোনায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, লকডাউনে কোটি কোটি মানুষের কাজ চলে গেছে, তেমন এক সঙ্কটপূর্ণ সময়েও পুঁজিপতিরা এমন বিপুল মুনাফা করতে পারল কী করে? কাদের দৌলতে? সরকারের ভূমিকা ছাড়া এটা সম্ভব? তা হলে এ কেমন সরকার? কার সরকার? সাধারণ মানুষের? না শুধুই পুঁজিপতি শ্রেণির? যদি এই সরকার সাধারণ মানুষের সরকার হত, তবে প্রধানমন্ত্রীর তো বলা উচিত ছিল যে, দেশের এমন এক দুঃসময়ে এত বিপুল মুনাফা অমানবিক, কুৎসিত, অন্যায়। এটা কাউকে করতে দেওয়া যায় না। অবিলম্বে এটা বন্ধ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী সাধারণ মানুষের কথা ভাবলে সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে, তাদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে এই সব অতি ধনীদের উপর তৎক্ষণাৎ বাড়তি কর চাপাতে পারতেন। কিন্তু চাপাননি! অথচ খাদ্যে, ওষুধে, ভোজ্য তেলে, জ্বালানি তেলের উপর, অর্থাৎ ইতিমধ্যেই মূল্যবৃদ্ধির ভারে ন্যুব্জ, কুব্জ সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা ক্রমাগত চাপিয়ে চলেছে বিজেপি সরকার। আর মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘোরাতে ধর্মের জিগিরে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ফাঁসিয়ে দিচ্ছে মানুষকে। এ এক ভয়ঙ্কর দুষ্টচক্র।

বাস্তবে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেস, বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম— সব সরকারের আমলেই সেই একই অপশাসন, একই রকম লুঠতরাজ, একই রকম দুর্নীতি। তবে কি এই অপশাসন-দুর্নীতি চলতেই থাকবে? বাস্তবে দলগুলির নাম আলাদা হলেও, পতাকার রঙ আলাদা হলেও নীতি তাদের একই— জনগণকে শোষণ কর, জনগণের সম্পত্তি লুঠ কর, আর পুঁজিপতিদের সেবা কর। এই ভোটসর্বস্ব দলগুলির নেতাদের লক্ষ্য বক্তৃতার ভোজবাজিতে মানুষকে ভুলিয়ে, তাদের অসহায়তাকে সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করে ক্ষমতার শীর্ষে পৌঁছানো। শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষকে তারা ভুলিয়ে দিতে চায় তাদেরও মানুষের মতো মাথা উঁচু করে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে ও সেই অধিকারটা ন্যায়সঙ্গত।

আজ শোষিত-নিপীড়িত প্রতিটি মানুষকে এ কথা উপলব্ধি করতে হবে, যে সরকার তাদের খাদ্য দিতে পারে না, চিকিৎসা দিতে পারে না, শিক্ষা দিতে পারে না, মাথার উপর একটা ছাদ দিতে পারে না, অথচ মদের ঢালাও ব্যবস্থা করে দেয়, ধর্মে ধর্মে বিরোধ বাধায়, দাঙ্গায় ফাঁসিয়ে দেয়, মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে সেই সরকার কখনও সাধারণ মানুষের সরকার নয়, সেই সরকার কখনও মানুষের কল্যাণ করতে পারে না। যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা শ্রমিকের পরিশ্রমের ন্যায্য মজুরি দেয় না, কৃষকের ফসলের ন্যায় দাম দেয় না, সেই ব্যবস্থা কখনও মেহনতি জনতার ব্যবস্থা হতে পারে না।

সারা দেশ জুড়ে শাসক দলগুলো আজ দেশের মানুষকে ভিখারি বানিয়ে দিতে চাইছে। অধিকার অর্জনের বদলে শাসকদের দয়ার উপর বাঁচতে শেখাচ্ছে। এটা কি বাঁচ? মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলছেন, যদি বাঁচতে হয় তবে মানুষের মতো বাঁচবো, মাথা উঁচু করে বাঁচবো। কুকুর বিড়ালের মতো বাঁচবো না, ভিক্ষাবৃত্তি করে বাঁচবো না। যখন মরব তখনও মাথা উঁচু করে মরব এবং সেই ভাবে বাঁচা ও মরার একটাই উপায়, তা হল, সমাজের আমূল পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের যে বিপ্লবী সংগ্রাম তাতে নিজেকে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা।

তাই শুধু ভোট দিয়ে একের পর এক সরকার বদলে এই দুঃসহ পরিস্থিতির বদল ঘটানো যাবে না। তার কারণ, এই গোটা ব্যবস্থাটাই আজ পচে গেছে। অন্যায়ের উপর গড়ে ওঠা ব্যবস্থার রক্ষাকর্তা নেতারা পচেছে, নীতি পচেছে। একমাত্র এই সমাজব্যবস্থাটাকে পুরোপুরি বদলে ফেলা ছাড়া মানুষের মুক্তির আর কোনও রাস্তা নেই। আর সেই মুক্তির রাস্তাটা চুপচাপ মেনে নেওয়ার মধ্যে নেই, পড়ে পড়ে মার খাওয়ার মধ্যেও নেই, রয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর মধ্যে, রুখে দাঁড়ানোর মধ্যে এবং সে মুক্তি ততক্ষণ আসবে না যতক্ষণ মুক্তিকামী মানুষ নিজে মুক্তির সংগ্রামে সামিল না হচ্ছে।

রুশ সাহিত্যিক টলস্টয় বলেছিলেন, শাসকদের আসল শক্তি নিহিত রয়েছে মানুষের অজ্ঞতার মধ্যে। তাই শোষিত মানুষকে তার নিজের স্বার্থেই অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে হবে। কিন্তু তা কোনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার দ্বারা হতে পারে না, পারে শুধুমাত্র গণআন্দোলনে, মানুষের মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দ্বারা।

আগামী ২৯ জুন প্রমাণ করবে মানুষ আর পড়ে পড়ে মার খেতে চায় না, মার খাওয়ার দিন শেষ। অতিমারির সময়েও যে ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির আকাশছোঁয়া মুনাফার সুযোগ করে দিতে পারে, যে আইন সেই অন্যায় মুনাফা-লুঠকে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে দেখায়, আইনসঙ্গত হিসাবে দেখায় সে ব্যবস্থায় মানুষের কল্যাণ হতে পারে না, সে আইন সাধারণ মানুষের আইন নয়, সেই আইন সভ্যতার আইন নয়, সেই আইন শাসকদের স্বার্থ রক্ষার আইন। সেই আইনকে ভাঙতে হবে। সেই আইন ভাঙারই ডাক দিয়েছে এসইউসিআই(সি)। আসুন ছাত্র-যুবক, আসুন শ্রমিক, আসুন কৃষক, আসুন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মেহনতি জনতা হাজারে হাজারে—২৯ জুন আমরা সেই আইনকে ভাঙি। অন্যায় আইন না ভাঙলে যে ন্যায়ের আইন প্রতিষ্ঠা করা যায় না!

পুলিশি হামলার নিন্দা

৬ জুন কলেজ স্ট্রিটে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভে রাজ্য সরকারের পুলিশি আক্রমণের নিন্দা করে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড মণিশংকর পট্টনায়ক এক বিবৃতিতে বলেন,

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে অনলাইন পরীক্ষার দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে রাজ্য সরকারের পুলিশ যেভাবে আক্রমণ চালিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। যে কোনও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর পুলিশের বর্বর আক্রমণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

তিনি বলেন, আমরা দাবি করেছিলাম, এই সময়ে ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠন-পাঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে এবং এরই মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের অফলাইন পরীক্ষা সম্পর্কে উদ্বেগ নিরসন করতে হবে। কিন্তু সরকার ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠনপাঠন ও তার পরিবেশ তৈরি না করে ছুটি ঘোষণা করে বারবার ছাত্রছাত্রীদের বিপদগ্রস্ত করেছে। আলোচনায় না গিয়ে হঠাৎ তারা অসমাপ্ত সিলেবাসেই পরীক্ষা ঘোষণা করে ছাত্রছাত্রীদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। দীর্ঘ দু'মাস প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে সরকার কার্যত ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার পরিবেশেরও চূড়ান্ত ক্ষতি করেছে। তাদের এই আচরণ অপরাধমূলক। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন সহ কিছু সুবিধাবাদী ছাত্র সংগঠন ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনের দাবি তোলার পরিবর্তে অন্যান্য কিছু দাবি তুলে তাদের পড়াশোনার অধিকারকে শক্তিশালী হতে দেয়নি ও মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। আমাদের দাবি, অত্যন্ত দ্রুত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিলেবাস কমিয়ে ও পরীক্ষার তারিখ খানিকটা পিছিয়ে সরকার অফলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিক।

ছুটি বাড়ানোর প্রতিবাদ

রাজ্য সরকার স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি আরও ১১ দিন বাড়ানোর তীব্র প্রতিবাদ জানাল এআইডিএসও। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক বলেন, অবিলম্বে সম্পূর্ণভাবে ক্লাসরুম ভিত্তিক পঠনপাঠন চালু করতে হবে। এই দাবিতে ১৪ জুন রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হয়।

জীবনাবসান

দলের পুরুলিয়া শহর লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড করুণা মাহাত দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন অসুস্থতার পর ৪ মে রাতে পুরুলিয়া সদর হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

কমরেড মাহাত নব্বইয়ের দশকে স্বামী কমরেড অভিরাম মাহাতর মাধ্যমে দলের সাথে পরিচিত হন এবং পরে দলের তৎকালীন জেলা সম্পাদিকা জননেত্রী কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্যের সাহচর্যে দলের কাজ শুরু করেন। কমরেড করুণা মাহাত বহু গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল দলের কর্মীদের জন্য সবসময় খোলা। কর্মীদের প্রতি ভালবাসা ও প্রয়োজনে তাদের শাসন করা, সব কিছুতে তাদের পাশে দাঁড়ানোর মধ্য দিয়ে অনেকটা অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন। দল বা মহিলা সংগঠনের কাজে তিনি ছিলেন সক্রিয়। ছেলেমেয়েদের শুধু নয়, প্রতিবেশী সহ আত্মীয়-স্বজনদেরও দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করতেন তিনি। জেলায় মহিলা সংগঠন ও মদ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রবল অসুস্থ অবস্থায় যখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন, তখনও দলের কাজকর্ম সম্পর্কে, কমরেডদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। প্রথাগত শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও দলের শিক্ষায় নিজের জীবন পরিচালনা করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিনি উন্নত চরিত্র অর্জন করেছিলেন। কমরেড করুণা মাহাতর প্রয়াণে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ, লড়াকু ও নানা গুণের অধিকারী এক কর্মীকে।

২২ মে পুরুলিয়া শহরের মানভূম ভিক্টোরিয়া স্কুলে পুরুলিয়া শহর লোকাল কমিটির উদ্যোগে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য।

কমরেড করুণা মাহাত লাল সেলাম

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মুর্শিদাবাদ জেলার বাগডাঙা লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড মন্টু শাহ ১১ এপ্রিল রাতে বহরমপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। ১৯৭৩ সালে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

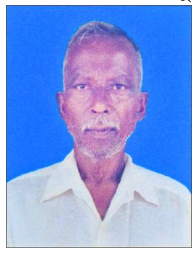

একসময় কঠিন দারিদ্রের জীবন কাটান তিনি। অত্যন্ত সহজ সরল জীবন যাপন তাঁকে এলাকার মানুষের আপনজন করে তুলেছিল। লেখাপড়া না জানলেও বহু বিষয় তিনি শুনে শুনে আত্মস্থ করার চেষ্টা করতেন। দলের দেওয়া যে কোনও কাজ তিনি করতেন আনন্দের সাথে। অসুস্থতার কারণে দলের কাজ তেমন কিছু করতে না পারায় কষ্ট পেতেন। সাধারণ মানুষের সাথে মেলামেশা ছিল তাঁর নাড়ির সম্পর্কের মতোই। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একনিষ্ঠ একজন কর্মীকে এবং সাধারণ মানুষ হারাল তাদের এক আপনজনকে।

কমরেড মন্টু শাহ লাল সেলাম

বহু ভাষাভাষী ভারতে কোনও একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া চলে না

মূল্যবৃদ্ধি বেকারি আর চরম দুর্নীতি— এই তিন জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তিত দেশের জনসাধারণ। অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকার নাকি সর্বদা চিন্তিত জাতীয় ঐক্য ও দেশভক্তির অভাব নিয়ে। তাই এক জাতি-এক ধর্ম-এক ভাষা তথা হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান অ্যাজেন্ডাটি সম্প্রতি আরেকবার ভালো করে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এবার প্রসঙ্গ ভাষা। সম্প্রতি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির ৩৭তম অধিবেশনে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, তিনি তথা কেন্দ্রীয় সরকার চায় দেশের অহিন্দিভাষীরা অন্য ভাষার মানুষের সাথে বিদেশি ইংরেজিতে নয় স্বদেশি হিন্দিতে কথা বলুন। অর্থাৎ প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা যাদের হিন্দি নয় তাদের সকলেরই অন্তত দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি হতে হবে।

সরকারি হিসেব বলছে, ভারতে ১৩০ কোটি মানুষের মাতৃভাষা কয়েক হাজার। এককভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ হিন্দি ভাষাতে কথা বলেন, এ কথা সত্য। আবার এ কথাটিও সত্য যে অ-হিন্দিভাষী মানুষের সংখ্যা হিন্দিভাষীদের প্রায় তিন গুণ। ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে ৩৫টি রাজ্যের মধ্যে ১২টির প্রথম পছন্দের ভাষা হিন্দি। বাকি ২৩টি রাজ্যের অধিকাংশ মানুষ অ-হিন্দিভাষী। যদিও হিন্দি বলতে ৫৬টি স্থানীয়ভাষা বা ডায়লেক্ট যেমন আওধি, মাঘাই, মৈথিলী, ভোজপুরি, রাজস্থানী ইত্যাদিকে একসঙ্গে ব্যাপকতর অর্থে হিন্দি বলে ধরে নিলে হিন্দিতে কথা বলা মানুষ দেশের ৪৩ শতাংশ বা ৫৩ কোটি। আর বাস্তবে হিন্দি ভাষা বলতে যা বোঝায়, তা ২৬ শতাংশ বা ৩১ কোটি মানুষের মাতৃভাষা। বাকি ৭৪ শতাংশ বা প্রায় ১০০ কোটি ভারতবাসী অ-হিন্দিভাষী। দেশের অ-হিন্দিভাষী ভিন্ন ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠীর এই ১০০ কোটির কাছাকাছি মানুষকে অন্য ভারতীয় ভাষাভাষিদের সাথে কথোপকথনের জন্য শুধু হিন্দিকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে বলার অর্থ বাংলা, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালায়ালাম ইত্যাদি ভাষাভাষী মানুষ ভিন্ন ভাষার মানুষের সাথে কথা বলবেন কেবলমাত্র হিন্দিতে। ইংরেজি একেবারেই বর্জনীয় হবে!

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হিন্দিকে পরোক্ষে 'জাতীয় ভাষা' করে তুলবার চেষ্টার এই মন্তব্যকে ঘিরে হিন্দিভাষী মানুষের প্রবল জনসমর্থন সরকার আশা করেছিল। কিন্তু তাঁদের এ নিয়ে তেমন কোনও উন্মাদনা বা ভাবান্তর লক্ষ করা যায়নি। অন্য দিকে অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই সারা দেশে হিন্দি, অহিন্দিভাষী নির্বিশেষে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই প্রস্তাব, পরিকল্পনা বা অভিসন্ধির প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং বিশেষ করে অহিন্দিভাষী দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে এর বিরুদ্ধে। বিরোধিতা এসেছে আসাম মণিপুর সহ উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি থেকেও।

বিজেপি বিষয়টিকে নিয়ে উন্মাদনা তৈরি করতে বদ্ধপরিকর। অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে তাই তারা প্রবল আক্রমণাত্মক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধ সমালোচনাকে দেশবিরোধী, জাতীয় ঐক্যবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়ার সংগঠিত প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে পুরোদমে। এই প্রচারে বিজেপির সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের বশংবদ সংবাদমাধ্যমগুলিও সামিল। এ ছাড়াও সক্রিয় আইটি সেল, ট্রোল বাহিনী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের বিরুদ্ধে যে কোনও সমালোচনাকে তীব্র আক্রমণ করা হচ্ছে, এমনকি উস্কে দেওয়া হচ্ছে হিংসার প্ররোচনাকেও।

নানা অজুহাতে হিন্দিকে সারা দেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা এবং অহিন্দিভাষী মানুষের তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার ঠিক পরে দেশের সংবিধান রচনার জন্য যে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি বা সংবিধান সভা গঠিত হয়েছিল সেখানেও এ নিয়ে প্রবল উত্তপ্ত বিতর্ক হয়েছিল। প্রশ্ন ছিল, পূর্ববর্তী ব্রিটিশ সরকারের ব্যবহৃত সরকারি ভাষা বা অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ স্বাধীন ভারতে অপরিবর্তিত থাকবে, নাকি এর পরিবর্তন করে হিন্দিকেই সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হবে। এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মতবিরোধের জন্য এমনকি সংবিধান সভা ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। এই বিস্ফোরক দ্বন্দ্বের পেছনে নিহিত ছিল জাত-পাত, ধর্ম, বর্ণ, প্রদেশ, ভাষা ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি সুসংহত জাতি গঠনের পথে অসংখ্য সংকীর্ণতা এবং অমীমাংসিত বিরোধ। ছিল সদ্য ক্ষমতাসীন জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বও।

এখানে মনে রাখা দরকার ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এ দেশে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি ক্ষমতা দখল করেছিল। এই শাসকরা ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে ছিল নিজেদের স্বার্থে। তাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সতর্ক রক্ষণশীল এবং আপসপন্থী। ধর্ম-বর্ণ জাতপাত প্রদেশ ও আঞ্চলিক সংকীর্ণতার সাথে তারা আপস করেছেন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সাথে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ঐতিহ্যবাদকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক মননের ভিত্তিতে সামাজিক রাজনৈতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আপসহীন সংগ্রামকে তারা দেখেছেন অত্যন্ত ভয়ের চোখে। এ ধরনের আন্দোলনকে হয় বাধা দিয়েছেন না হলে এড়িয়ে চলেছেন। কারণ তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, জাতপাত ধর্মের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের দাবিতে সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম পরিচালিত হলে তা তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

ভারতে স্বাধীনতা যখন দোরগোড়ায় তখন সারা বিশ্বে পুঁজিবাদী অর্থনীতি চরম সংকটগ্রস্ত। বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ির পরিণামে পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি দ্বিতীয় বার বিশ্বযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। তার দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে বিশ্ব পুঁজিবাদের আরও গভীরতর সংকট। অন্য দিকে এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী বাজার ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শোষণহীন রাষ্ট্র সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে দেখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো এ দেশের মানুষেরও উন্নততর জীবনের প্রতি গভীর আবেগ ও আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। এ দেশেও সম্ভাব্য বিপ্লবের আতঙ্কে চরম আতঙ্কিত ছিল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি। সুভাষচন্দ্রের আপসহীন সশস্ত্র জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যে কোনও উপায়ে প্রতিহত করার অপচেষ্টার কারণ নিহিত ছিল এই টানাপোড়েনের মধ্যেই। আমরা সকলেই জানি এই অনিরসনীয় দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণিই জয়লাভ করেছিল। সক্ষম হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করতে। পরিণামে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সমাজ গঠন তথা বহু ভাষা সংস্কৃতি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ একটি সুসংবদ্ধ শক্তিশালী জাতি গঠনের প্রক্রিয়া অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল এ দেশে। যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে ধর্মীয় অন্ধতা গোঁড়ামি সহ যে কোনও রকমের সংকীর্ণতা, কূপমণ্ডুকতা থেকে মুক্তির সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে এড়িয়ে যাওয়ার পরিণামে সদ্য স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থেকে গেল জাতপাত ধর্ম বর্ণ ভাষা প্রদেশ ইত্যাদিকে ভিত্তি করে বিরোধের বীজ। বৃহৎ জাতি-ধর্ম ভাষাগোষ্ঠীর আধিপত্যের মানসিকতা আর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বা দুর্বল গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার তাগিদ। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির হাতে যে বিরোধ রাজনৈতিক স্বার্থে শোষিত মানুষের ঐক্যকে ভাঙার হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে পরবর্তীকালে।

উল্লিখিত সংবিধান সভায় হিন্দি বলয়ের প্রভাবশালী সদ্য ক্ষমতাসীন জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের একজন শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডনকে সামনে রেখে সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিল যাতে হিন্দি জাতীয় ভাষা না হলেও অন্তত একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, ইংরেজি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা। সেই ইংরেজিকে স্বাধীন ভারত যেন সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ না করে। তিনি অ্যাসেম্বলিতে আকুল আবেদন করেছিলেন যে জাতীয় ঐক্যের কথা ভেবে কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির সদস্যরা অন্তত এইটুকু মেনে নিন। কট্টর দক্ষিণপন্থী এই নেতার সেদিনের এই দাবির পিছনে নিহিত ছিল হিন্দি বলয়ের বৃহৎ পুঁজিপতিদের সারা দেশে রাজনৈতিক আধিপত্যের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রতিস্পর্ধী পুঁজিপতিদের হিন্দি বলয়ের বৃহৎ পুঁজিপতিদের প্রতি আনুগত্যই তাঁদের কাছে জাতীয় ঐক্যের সমার্থক ছিল। হিন্দিকে জাতীয় কিংবা একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে মেনে নেওয়া ছিল সেই ঐক্য রক্ষা অথবা আনুগত্যের নিদর্শন। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের প্রতিনিধিরা সঙ্গত কারণেই তা মানেননি।

স্বাধীন ভারতের শাসক শ্রেণি ইংরেজিকে সাম্রাজ্যবাদীদের ভাষা হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা প্রথম থেকেই করেছে। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, ইংরেজি ভাষার হাত ধরেই এদেশের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও শিল্প কলকারখানার বিকাশ। আধুনিক গণতান্ত্রিক ধারণা ও উন্নত সামাজিক ব্যবস্থা ও জীবনের প্রতি জনগণের আকর্ষণ। তাকে ভিত্তি করে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা। এক কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ইংরেজি ভাষার অবদান অবিস্মরণীয়। ইংরেজি ভাষা চর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করেই আমাদের দেশে রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী শিক্ষায় ইংরেজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেছিলেন। ইংরেজি যেমন ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা ছিল তেমনি সেই সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের তেজ অনুপ্রেরণা এবং ভাবগত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল ইংরেজি ভাষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মধ্য দিয়েই। এই ঐতিহাসিক ঘটনা মার্ক্সবাদের ভাষা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে যে, ভাষার নিজস্ব কোনও শ্রেণিচরিত্র নেই। একই সাথে একটি ভাষা একটা সমাজের শাসক এবং শাসিত উভয় শ্রেণির চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে।

বিশেষ কোনও ভাষার সাথে বিশেষ কোনও ধর্মেরও কোনও সম্পর্ক নেই। ভাষাকে ধর্ম সম্প্রদায় ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত করা, কোনও একটি ভাষাকে অন্য ভাষাভাষী মানুষের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে বিদ্বেষের বাতাবরণ তৈরি করার জন্য কোনও ভাষার নিজস্ব কোনও বৈশিষ্ট্য কখনওই দায়ী নয়। প্রতিক্রিয়াশীল শাসকগোষ্ঠী ভাষাকে ব্যবহার করে এ ধরনের কাজ করে। ইংরেজিকে সাম্রাজ্যবাদের, উর্দুকে মুসলমানের কিংবা হিন্দিকে হিন্দুর ভাষা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া সেই অপকর্মের একটি দৃষ্টান্ত মাত্র।

কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে সে দিন প্রশ্ন উঠেছিল, ইংরেজি ভাষাকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় শিল্পসাহিত্যে যে সম্পদ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি বলা উচিত? সেই উত্তরাধিকারকে স্বাধীন ভারতবর্ষ গ্রহণ করবে কি করবে না। পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন যখন জাতীয় ঐক্যের ধুয়ো তুলে ইংরেজিকে বিদায় করার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন তখন তাঁকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেছিলেন, দেশের উত্তর ও দক্ষিণের ঐক্য সম্ভব হয়েছে ইংরেজি ভাষার

সাতের পাতায় দেখুন

বাঁধে ধস মেরামতের দাবি

গত বর্ষার পর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার রূপনারায়ণ নদীবাঁধে হরিশপুর মৌজায় সামুইহালে প্রায় ২০০ মিটার অংশে বিপজ্জনকভাবে ধস নামে। পার্শ্ববর্তী শ্যামসুন্দরপুর মাজী পাড়া সহ বেশ কয়েকটি স্থানে ফাটল দেখা দেয়। গত ৮ ডিসেম্বর দ্রুত ফাটল মেরামতে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ সহ হুগলি জেলার অংশে চর অপসারণের জন্য সেচমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়। আবার বর্ষা এসে গেলেও সেচ দপ্তর ওই ফাটল মেরামতে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

অতি দ্রুত ফাটল মেরামতের দাবি জানিয়ে ১ জুন রাজ্যের সেচমন্ত্রী সহ পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক এবং সেচ দপ্তরের সমস্ত আধিকারিকদের ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, ৭ জুনের মধ্যে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু না হলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাব। সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা কাজ শুরুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

নাগরিক নিরাপত্তার দাবিতে থানায় বিক্ষোভ

কলকাতার ভবানীপুর এলাকায় এক দম্পতির নৃশংস ভাবে খুন হওয়ায় এলাকার নাগরিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, ঘটনায় অভিযুক্তদের তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তি, এলাকায় পুলিশি টহলদারি বাড়ানোর দাবিতে এসইউসিআই(সি) ভবানীপুর লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে ৯ জুন ভবানীপুর থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়। চক্রবেড়িয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি মিছিল থানা পর্যন্ত যায়। সম্পাদক কমরেড দুখশ্যাম মণ্ডলের নেতৃত্বে তিন জনের প্রতিনিধিদল ওসি-কে স্মারকলিপি দিলে তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে মিছিল সিউড়িতে

বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি এলাকার হকারদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে ৯ জুন শতাধিক হকার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের এক মিছিল সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে। হকার সমস্যার স্থায়ী সমাধান, পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ না করা এবং টাউন ভেন্ডিং কমিটি গঠন প্রভৃতি দাবিতে অল বেঙ্গল হকার্স ইউনিয়নের সিউড়ি শাখার পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি মানস সিংহের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসক ও পৌরসভার চেয়ারম্যানের কাছে স্মারকলিপি দেন। হকারদের দাবিগুলি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক শান্তি ঘোষ সহ জেলা নেতৃত্ব।

শহিদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য স্মরণ

৬ জুন পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালের চেঁচুয়া হাটে ১৪ শহিদের স্মৃতিস্তম্ভে মাল্যদান করেন 'ঘাটাল মহকুমা প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য জন্মশতবার্ষিকী কমিটি'র সদস্যরা।

১৯৩৬ সালে দাসপুরের অত্যাচারী ভোলা দারোগা ও অনিরুদ্ধ সামন্তকে চরম দণ্ড দেয় স্থানীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকারীরা। ঘটনায় ক্ষিপ্ত পুলিশ ৬ জুন চেঁচুয়া হাটে আন্দোলনকারীদের চারদিক থেকে ঘিরে ১৪ জনকে গুলি করে হত্যা করে। এই দিনটিতে ১৪ শহিদকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কমিটির উদ্যোগে মাল্যদান অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন মধুসূদন মান্না, কানাইলাল পাখিরা, কমিটির সম্পাদক সুব্রত মাজী প্রমুখ।

আদিবাসী তরুণীকে প্রতারণার প্রতিবাদ জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির

ডেবরার বিধায়ক তথা কারিগরী শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের বিরুদ্ধে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে ডেবরার আদিবাসী তরুণী সবিতা লায়েককে বঞ্চনা, প্রতারণা ও অবমাননার প্রতিবাদে সোচ্চার অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি। সংগঠনের প্রতিনিধিরা আতঙ্কিত ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন এবং ডেবরা থানা ও পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। মেদিনীপুর শহরে পথসভা ও বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়। বিভিন্ন ব্লক অফিসেও বিক্ষোভ-ডেপুটেশন হয়।

অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য মন্ত্রীর স্ত্রীর চাপ দেওয়ার প্রতিবাদ জানিয়ে মেদিনীপুর শহর ও বেলদাতে বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট নাগরিকদের কনভেনশন হয় এবং জেলায় অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটি গঠিত হয়। কমিটি ৬ জুন জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেয়। কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়— সবিতার পরিবারকে উপযুক্ত নিরাপত্তা দিতে হবে, তাঁকে যোগ্যতা অনুযায়ী স্থায়ী চাকরি দিতে হবে, তাঁর প্রতি অবমাননা ও প্রতারণার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রী ও পুলিশ অফিসারদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে, কেশিয়াড়ি ব্লকের পাঁচিয়াড়া এলাকার ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া ২ জনকে অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে।

গণ আইন অমান্যের প্রস্তুতিতে মিছিল

২৯ জুন গণ আইন অমান্য সফল করতে দলের নদিয়া জেলা কমিটি ৮ জুন কৃষ্ণনগর শহরে মিছিল করে। নেতৃত্ব দেন জেলা সম্পাদক কমরেড মৃণাল দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য মৃদুল দাস, জেলা কমিটির সদস্য হররোজ আলি শেখ প্রমুখ।

আসামে চা-বাগান ধ্বংসের প্রতিবাদ

আসামের শিলচরে বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য ডলু চা-বাগানের জমি অধিগ্রহণ করেছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন হিমন্ত বিশ্বশর্মা সরকার। ২১ মে দুই শতাধিক বুলডোজার নামিয়ে ওই চা-বাগান ধ্বংস করে পুলিশ-প্রশাসন। এর ফলে কয়েক হাজার চা শ্রমিকের জীবনে অন্ধকার নেমে এল। এর প্রতিবাদ জানালে চা-শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালায় বিজেপি সরকারের পুলিশ। প্রতিবাদে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত চা-শ্রমিক সংগঠন নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যানটেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন রাজ্যে নানা প্রতিবাদ কর্মসূচি নেয়। প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গে আসামগামী ট্রেনে পোস্টার লাগান ইউনিয়নের কর্মীরা।

নামমাত্র বৃদ্ধি নয়, অবিলম্বে চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দিতে হবে ঃ এআইইউটিইউসি

৮ জুন মুখ্যমন্ত্রীর চা-শ্রমিকদের ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ওই দিন এক বিবৃতিতে বলেন, চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মালিকদের স্বার্থে অযথা টালবাহানা করা হচ্ছে। ফলে চা শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ২০১৫ সালে রাজ্য সরকার দু'বছরের মধ্যে চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য অ্যাডভাইসারি কমিটি গঠন করেছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি। আবার রাজ্য সরকার এ বছর ফেব্রুয়ারিতে নতুন পরামর্শদাতা কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিও অজ্ঞাত কারণে এখনও ন্যূনতম মজুরি বিষয়ে কোনও রিপোর্ট জমা দেয়নি। এই সরকার বা পূর্বের কোনও সরকারই চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করেনি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং চা-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি অবিলম্বে নির্ধারণ ও চালু করার দাবিতে চা-শ্রমিকরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাই ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ না করে মুখ্যমন্ত্রী যে সামান্য মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন তার আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি এবং অবিলম্বে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও চালু করার দাবি করছি।

এনবিটিপিইইউ-এর প্রতিবাদ ঃ ৮ জুন মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার প্রতিবাদ জানিয়ে নর্থ বেঙ্গল টি প্ল্যান্টেশন এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় বলেন,

দীর্ঘ সাত বছর যাবৎ চা শ্রমিকদের বিভিন্ন সংগঠন ঐক্যবদ্ধ ভাবে চা-শিল্পে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার দাবি জানিয়ে আসছে। ২০১৫ সালের ত্রিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী ২০১৭-এর গোড়াতেই ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত হওয়ার কথা। কিন্তু আজও তা হয়নি। এর মধ্যে রাজ্য সরকার একতরফাভাবে, মর্জিমাফিক এবং বৈষম্যমূলক ভাবে কয়েক দফায় যে অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে তা এই শিল্পের মজুরি বা বেতনের ক্ষেত্রে নৈরাজ্য কায়েম করেছে। বেতনক্রম সংশোধন না হওয়ায় কর্মচারীদের একটি বিরাট অংশের মাসিক ইনক্রিমেন্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং সর্বস্তরের শ্রমিক-কর্মচারীরাই প্রত্যেক মাসে বিরাট অঙ্কের লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। এই অবস্থায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মজুরি ঘোষণার লিখিত ও অফিসিয়াল কমিটমেন্ট সাপেক্ষে স্বল্প সময়ের জন্য মজুরি বা বেতনবৃদ্ধি সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক বোঝাপড়ায় যেতে আমরা সম্মত হয়েছিলাম এবং এ ব্যাপারে দু-দুটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক বিগত দু'মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ জুনের বৈঠকে শ্রমসচিব ১০ দিনের মধ্যে শ্রমমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিষয়টি চূড়ান্ত করার প্রতিশ্রুতি দেন। এই অবস্থায় হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা আমাদের বিস্মিত করেছে। ১৫ শতাংশ মজুরি বৃদ্ধির এই ঘোষণা অগণতান্ত্রিক ও অন্যায়। এর কোনও ভিত্তি বা যুক্তি আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানানোর সাথে সাথে শ্রমসচিবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানের লক্ষ্যে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার দাবি জানাচ্ছি।

শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রাখুন

একের পাতার পর

ভারতীয় অর্থনীতি বাণিজ্যিক ভাবে যে দেশগুলি থেকে লাভবান হয় তাদের দ্বারা তীব্র সমালোচিত হওয়ার পরও বিজেপি নেতাদের ঘুম ভাঙতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগেছে এবং তারা তাদের মুখপাত্রদের 'নগণ্য ব্যক্তি' হিসাবে দেখিয়ে লঘুদণ্ড দিয়েছেন। এটা সাধারণ মানুষের চোখে ধুলো দেওয়ার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শুধু ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপরেই নয়, এই পরিকল্পিত এবং ভয়াবহ আক্রমণ চালানো হচ্ছে সেকুলার মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরেও, যা আরও ভয়ঙ্কর।

এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের নিন্দা জানানোর জন্য কোনও ভাষাই যথেষ্ট নয়। এই সঙ্কটজনক সময়ে প্রয়োজন সকল স্তরের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করে এই ভয়াবহ বিপদকে প্রতিহত করা।

বাজার উচ্ছেদের প্রতিবাদে মুরাদাবাদে আন্দোলন

উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার এখন বুলডোজার দিয়ে খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিযানে নেমেছে। সম্প্রতি সে রাজ্যের বিজেপি প্রশাসন মুরাদাবাদে একশো বছরের পুরনো একটি স্থায়ী সবজি বাজার বুলডোজার চালিয়ে তছনছ করে দিয়েছে। ফলে বিরাট সংখ্যক সবজি ও ফলবিক্রেতার রুজিরুটি সঙ্কটে পড়েছে। প্রতিবাদে এবং সবজি বাজার ওখানেই চালু রাখার দাবিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিক্রেতারা 'জীবিকা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'-র নেতৃত্বে ৩০ মে থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধরনায় বসেন এবং মুরাদাবাদের জেলাশাসকের কাছে ওই বাজারের বৈধ কাগজপত্র সমেত স্মারকলিপি পেশ করেন। ধরনার সমর্থনে ও বাজার চালু রাখার দাবিতে এস ইউ সি আই (সি)-র জেলা কমিটি এবং এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস, এআইকেকেএমএস-এর মুরাদাবাদ শাখার পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই(সি) জেলা সম্পাদক কমরেড বিজয়পাল সিং। অন্যান্য কিছু সংগঠন ও রাজনৈতিক দলও ধরনায় সংহতি জানায়।

আন্দোলনের চাপে সরকারি প্রশাসন সমিতির প্রতিনিধিদের বৈঠকে আমন্ত্রণ জানালে 'জীবিকা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি'-র সভাপতি, এস ইউ সি আই (সি)-র উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড হরকিশোর সিংহের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল প্রশাসনের সাথে আলোচনায় বসেন। এডিএম (শহর) ও নগরপ্রশাসক সবজি বাজার ওখানেই চালু রাখা অথবা বিকল্প কোনও উপযুক্ত স্থানে বাজার তৈরি করার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিজেপি সরকারের এই বুলডোজার নীতি ও গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংসের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে 'জীবিকা বাঁচাও আন্দোলন সমিতি' শহর জুড়ে ব্যাপক প্রচার চালায় যা ব্যাপক জনসমর্থন পায় এবং সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মানুষের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে।

ত্রিপুরা বিধানসভা উপনির্বাচনে দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এস ইউ সি আই (সি)

২০২৩-এর শুরুতেই ত্রিপুরা বিধানসভা নির্বাচন। ঠিক আট মাস আগে চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন হতে চলেছে। এই উপনির্বাচনে এসইউসিআই(সি) দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

ত্রিপুরায় একটানা ২৫ বছর সরকারে ছিল সিপিএম। ওই সময় পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে জনবিরোধী নীতি নেওয়া, প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করা এবং প্রতিটি স্তরে দুর্নীতি প্রসারের ফলে জনমনে সিপিএম বিরোধী মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। তারই সুযোগে বিজেপি রাজ্যে কোনও সংগঠন না থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস ও সিপিএম নেতা-কর্মীদের ভাঙিয়ে এনে আইপিএফটি-র সঙ্গে জোট করে ২০১৮-র নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করে। গত নির্বাচনের আগে বিজেপি দুর্নীতিমুক্ত স্বচ্ছ প্রশাসন, বেকারদের চাকরি সহ বহু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু গত চার বছরে সে-সব প্রতিশ্রুতি রক্ষা দূরে থাক, রাজ্য জুড়ে নেমে এসেছে অরাজকতা, তোলাবাজি, বাইক বাহিনীর সন্ত্রাস, বিরোধী দলগুলির উপর আক্রমণ এবং অফিস ভাঙচুর, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর হামলা ইত্যাদি। মূল্যবৃদ্ধি, ভয়াবহ বেকারি, অভাব-অনটনে সাধারণ মানুষ দিশেহারা। খাদ্য শিক্ষা স্বাস্থ্য সহ প্রতিটি ক্ষেত্র বিপর্যস্ত। বিশুদ্ধ পানীয় জলটুকু পর্যন্ত মানুষ পাচ্ছে না। শ্রমজীবী মানুষের কোনও কাজ নেই, রেগার কাজ পর্যন্ত বন্ধ। কৃষকরা ফসলের দাম পাচ্ছে না। সরকার রাজ্যকে নেশামুক্ত করার স্লোগান তুললেও গোটা রাজ্যই কার্যত নেশার কবলে। খুন ও ধর্ষণ নিত্যদিনের ঘটনা।

এই রকম পরিস্থিতিতে সিপিএম সহ অন্যান্য দলগুলি জনস্বার্থে তেমন কোনও আন্দোলন গড়ে তুলছে না। সাধারণ মানুষ অসহায় ভাবে নিরাপত্তাহীন দিন কাটাচ্ছে। এস ইউ সি আই (সি) তার নিজস্ব শক্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলছে। এই পরিস্থিতিতেই আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এস ইউ সি আই (সি) উপনির্বাচনে ২টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। ৬-আগরতলা কেন্দ্রে কমরেড মলিন দেববর্মা এবং ৮-টাউন বড়দোয়ালি কেন্দ্রে কমরেড শিবানী ভৌমিক দলের প্রার্থী হিসাবে টর্চ চিহ্ন নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দলের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই দুই প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ঃ ক্ষতিপূরণের দাবি

৯ জুন বাঁকুড়া লালবাজারে স্নানঘাট সবজিবাজারের কাছে এক বস্তিতে বিদ্যুৎ পরিষেবার ত্রুটির ফলে এক ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যান। অ্যাবেকার বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক সহ অন্য সদস্যরা নিহতের স্ত্রী ও পরিজনদের সমবেদনা জানানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে দাবি জানান, অবিলম্বে লাইন মেরামত ও মৃতের অসহায় পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শিক্ষায় দলবাজির পথ প্রশস্ত করা এবং স্কুলে ছুটি বাড়ানোর প্রতিবাদ

মুখ্যমন্ত্রীকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য হিসাবে নিয়োগের বিল পাশ করানো এবং গরমের কারণ দেখিয়ে আরও ১১ দিন ছুটি বাড়ানোর তীব্র বিরোধিতা করে ও সর্বত্র শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১৩ জুন এক বিবৃতিতে বলেন,

আজ বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য হিসেবে নিয়োগ করার বিল পাস করানোর দ্বারা শিক্ষায় আরও দলীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করা হল। এর দ্বারা গণতান্ত্রিক শিক্ষার উপর রাজ্যের তৃণমূল সরকার যেমন নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে আনল, তেমনই গ্রীষ্মের কারণ দেখিয়ে আরও ১১ দিন ছুটি বাড়ানোর মাধ্যমে স্কুলশিক্ষাকে বাস্তবে প্রহসনে পরিণত করার দিকে আরও একধাপ ঠেলে দেওয়া হল। আমরা মনে করি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল বা মুখ্যমন্ত্রী নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য পদে আসীন হওয়া উচিত যথার্থ কোনও শিক্ষাবিদের। এটাই গণতান্ত্রিক শিক্ষা ও স্বাধিকার রক্ষার রীতি। কংগ্রেস, বিজেপি সহ সরকারি ক্ষমতায় থাকা দলগুলি গণতান্ত্রিক শিক্ষার এই রীতির উপর ক্রমাগত আক্রমণ করছে। আমরা এই অগণতান্ত্রিক ও শিক্ষাস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানাচ্ছি।

আরও নিন্দনীয় হল, বিজেপির প্ররোচনামূলক মন্তব্যের পরিণামে যখন শান্তি-সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে, নানা জায়গায় বিচ্ছিন্ন, অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়ে শান্তি-সম্প্রীতি রক্ষার দিকে নজর না দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে আচার্য করার জন্য তড়িঘড়ি বিল পাশ করাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল রাজ্য সরকার। আজও বিজেপি বিধায়করা বিধানসভার বাইরে 'হিন্দু ধর্মে'র মানুষকে এক হওয়ার স্লোগান দিয়ে বিজেপির মুখপাত্রের মন্তব্য যে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন। আমরা ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে সকল প্রকার মৌলবাদের বিরুদ্ধে জনজীবনের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

ত্রিপুরায় এআইকেকেএমএস-এর সম্মেলন

আগরতলার ত্রিপুরা স্টুডেন্টস হেলথ হোমে গত ৯ জুন অনুষ্ঠিত হল এআইকেকেএমএস-এর প্রথম ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন। তিনটি জেলা থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। শহিদ বেদিতে মাল্যদান ও দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের শহিদ স্মরণে নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে সম্মেলন শুরু হয়। প্রস্তাব পাঠের পর প্রতিনিধিরা তা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রধান বক্তা, সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই(সি)-র ত্রিপুরা রাজ্য সম্পাদক কমরেড অরুণ ভৌমিক। সম্মেলন থেকে কমরেড বিভুলাল দে-কে সভাপতি ও কমরেড সুব্রত চক্রবর্তীকে সম্পাদক করে ১৪ সদস্যের রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়।

হলদিবাড়িতে ছাত্রবিক্ষোভ

এ বছর কোচবিহার জেলায় হলদিবাড়ি হাইস্কুল উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি না রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বাভাবিক ভাবেই প্রবল সমস্যায় পড়ে বিরাট সংখ্যক ছাত্রছাত্রী। প্রতিবাদে এআইডিএসও হলদিবাড়ি ব্লক কমিটির নেতৃত্বে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ৭ জুন স্কুলের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। প্রধান শিক্ষককে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। কিন্তু স্কুল-কর্তৃপক্ষ দাবি মানতে রাজি না হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা হলদিবাড়ি ট্রাফিক মোড় অবরোধ করে।

অবরোধ তোলার নামে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা করে ও ছাত্রছাত্রীদের গ্রেপ্তার করে। অবশেষে পুলিশের মধ্যস্থতায় স্কুল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আলোচনা হয়। শেষপর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়টি চালু রাখার ও এতে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সংগঠনের ব্লক কমিটির সম্পাদক বুলবুল সরকার আন্দোলনের এই জয়ে এলাকার ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ মানুষকে অভিনন্দন এবং পুলিশের ভূমিকাকে ধিক্কার জানান। এই জয়ে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা সংগঠনকে অভিনন্দন জানান।

পাঠকের মতামত

কদর্যতা প্রতিবাদ নয়

মুখ বিকৃত করে, বিড়ি টানতে টানতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, নরেন্দ্র মোদি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ নানা ব্যক্তি সম্পর্কে অশ্লীল ভাষায় ইউটিউব-ভিডিও বানিয়েও যে হাজার হাজার টাকা রোজগার করা যায়, সদ্য গ্রেপ্তার হওয়া এক ব্যক্তি কিন্তু তা দেখিয়ে দিল। রোজগারের এমন সহজ পন্থা থাকতে মানুষ কেন অন্য কিছু ভাববে? এ তো বেকারত্বের সহজ সমাধান। তাই ইদানীং বেশ কিছু মানুষ, সারাদিন কে কী খাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে, কী কী রান্না করছে, সেসব নিয়ে ইউটিউব ভ্লগ বানাচ্ছে এবং সেখান থেকে রোজগার করছে। যদিও সবার পক্ষে ওই কাঙ্খিত স্বপ্ন ছোঁয়া সম্ভব হয় না। তবুও নিজেকে প্রকাশ করার এই সহজ সরল মাধ্যমকে কজনই বা অস্বীকার করতে পারছে?

প্রসঙ্গ সেটা নয়। প্রসঙ্গ হচ্ছে এই অশ্লীল খেউড়ে কেউ কেউ নাকি প্রতিবাদের নতুন রূপ খুঁজে পেয়েছেন এবং সেটাকে জাস্টিফাই করতে নানা যুক্তির অবতারণা করছেন। যুক্তির সেই অদ্ভুত চর্চায় এখন সামাজিক মাধ্যম রমরম করছে। যদিও এটাও ওই ব্যক্তির জনপ্রিয়তাকে একটা উচ্চতা দিচ্ছে। তাকে নিয়ে চর্চা চলছে, কেউ পক্ষে বলছে, কেউ বিপক্ষে। এই সৌভাগ্যই বা ক'জনের হয়েছে! কই আপনাকে নিয়ে তো কেউ চর্চা করে না? প্রচারে থাকতে গেলে সবসময় ভালো কিছু করতে হবে সেটা আপনাকে কে বলেছে? আপনি এরকম গালাগালি দিয়ে একটা ভিডিও আপলোড করে দিন। ব্যাস, দেখবেন আপনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন। এটাও সেরকমই একটা চেষ্টা। খুব অবাক লাগে যখন কেউ বলে, কই রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে যখন অপমান করছিল, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যখন অশালীন কথা বলছিল, তখন তো তাকে গ্রেফতার করেনি? মানে যেটা দাঁড়াচ্ছে, কারও একটা অন্যায়ের সময় যেহেতু তুমি চুপ ছিলে, তাই অন্য অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তোমাকে চুপ থাকতে হবে। এটা বলছে না যে, এই কদর্য অশ্লীলতা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। প্রতিবাদের নামে এই বিকৃত রুচি, এই ভাষা সত্যিকারের প্রতিবাদকে কলঙ্কিত করবে, তাকে বিপথে পরিচালিত করবে। তাই যে কোনও শর্তে এটা বন্ধ হওয়া উচিত। প্রতিবাদের এই প্যাটার্নকে যদি আমরা মান্যতা দিই, একটা নতুন রূপে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে সমাজে সেটার প্রয়োগ কিন্তু বাড়বে। যদি বাড়ে তবে সমাজে হাজার হাজার এমন মানুষ তৈরি হবে। পুঁজিবাদ সবসময় জনগণের ক্ষোভ সামলাতে নতুন নতুন উদ্ভাবনী পন্থা অন্বেষণ করে। তাই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার পরিবর্তে ফেসবুকে গঞ্জিকাযুক্ত বিড়ি সেবন করতে করতে খেউড়-বিপ্লব করার পথটাকেই যদি আমরা নানা কুযুক্তির মাপকাঠিতে ন্যায়সঙ্গত মনে করি, তবে পুঁজিবাদের পক্ষে তার থেকে উত্তম ব্যবস্থা আর কী হতে পারে?

সূর্যকান্ত চক্রবর্তী
তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

চা শ্রমিক

আপনাদের কাগজে ('দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে...', ৭৪-৪২ সংখ্যা) ফুটে ওঠা চা শ্রমিকদের অনন্ত কালের জীবন-যন্ত্রণা পড়ে মনটা ভারী হয়ে উঠল। আমরা যারা উত্তরবঙ্গের সৌন্দর্য উপভোগে বেড়াতে যাই, তাদের কাছে শ্রমিকদের এইসব দৈনন্দিন খুঁটিনাটি অধরাই থেকে যায়। কবে যে এই সব গরিব-গুর্বো শ্রমিকরা বাঁচার মতো ন্যূনতম সুযোগ পাবেন তা ভাবতেই পারছি না। এঁদের না আছে শ্রমের উপযুক্ত মূল্য, না জীবনের অন্য কিছু বৈচিত্র্য। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার সামান্য চাহিদাটুকুও পূরণ না করে এ দেশের মালিক শ্রেণি শুধুমাত্র লাভের আশায় এদের চরম প্রতারণা করে আসছে যুগের পর যুগ। এরাও বংশপরম্পরায় অদৃষ্টের লিখন ধরে নিয়ে হাসি মুখে সব সহ্য করে আসছেন। সত্যিই, 'ছোটা আদমী'-দের কথা কারাই বা শুনবে?

এই সময়ে এনবিটিপিইইউ-এর নেতৃত্ব যৌথভাবে আন্দোলনে নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে শুরু করার কাজকে জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। ন্যূনতম মজুরির চাহিদার সাথে অন্যান্য দাবিগুলি নিয়ে আন্দোলনের অগ্রগতি জানার সাগ্রহ অপেক্ষায় থাকলাম।

সুনন্দ ভট্টাচার্য
কলকাতা-৩৪

উন্নয়নের পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন ঢাকতে পারে না নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ

২ মে বহরমপুরের রাস্তায় কলেজছাত্রী সুতপা চৌধুরির পৈশাচিক খুন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার কার্যকারিতাকে আরও একবার বিরাট প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করাল। 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও'-এর ভারত হোক বা 'কন্যাশ্রী'র পশ্চিমবঙ্গ, নারীরা এ দেশে কেমন আছেন কী ভাবে বাঁচছেন, রোজকার সংবাপত্রেই তার পরিচয় মেলে। দিন মাস বছর পেরোয়, একটি তথাকথিত সভ্য দেশে খুন-ধর্ষণ-শ্লীলতাহানি-নারীপাচারের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলে। ১৯৯০-এর বানতলা, ২০১২-র দিল্লি, ২০১৩-র কামদুনি। পার্কস্ট্রিট-গাইঘাটা-কড়েয়া-নাকতলা, কাঠুয়া-উন্নাও-হাথরস। সাম্প্রতিক অতীতে নদীয়ার হাঁসখালি, মুর্শিদাবাদের বহরমপুর। শাসক পাল্টায়, তারিখ পাল্টায়। নারী নির্যাতনের বীভৎস ছবিটা পাল্টায় না। একদিকে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পাতাজোড়া উন্নয়নের বিজ্ঞাপন, অন্য দিকে নির্যাতিত নারীর আর্তনাদ। সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, শুধুমাত্র গত এক বছরে ৩৬,৪৩৯টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে বাংলায়। ২০১৯ এ প্রতি ১৬ মিনিটে একটি করে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস বুরোর তথ্য বলছে, ধর্ষণের ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে। বলা বাহুল্য, নির্যাতনের প্রকৃত সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি, কারণ পারিবারিক চাপ, লোকলজ্জার ভয় এর মতো নানা কারণে একটা বড় সংখ্যক অপরাধ প্রকাশ্যে আসে না। সংবাদপত্র খুললে বুক কেঁপে ওঠে, কন্যাসন্তানের মা-বাবা শিউরে ওঠেন সন্তানের ভবিষ্যত ভেবে।

প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এমন লাগামছাড়া ভাবে বাড়ছে ধর্ষণের ঘটনা? সরকার কি এই জঘন্য অপরাধ কমাতে এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে? বাস্তব কিন্তু ঠিক উল্টো। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ঢাকঢোল পিটিয়ে আনা হচ্ছে দুয়ারে মদ প্রকল্প, কিছু ওয়েবসাইটে চলছে 'রেপ গেম', সাইবার পর্নোগ্রাফি নিয়ে কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে, বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে প্রতিনিয়ত নারীদেহকে ভোগ্যপণ্য হিসাবে দেখানো হচ্ছে। অর্থাৎ যেসব জিনিস মানুষকে প্রবৃত্তির দাস বানায়, বিকৃত যৌনতা উসকে দেয়, দিনের পর দিন তার উদযাপন চলছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সরকারি মদত ছাড়া এ জিনিস যে ঘটতে পারে না , সেটা আরও বোঝা যায় এইসব প্রশ্নে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত নিষ্ক্রিয়তা নীরবতা দেখলে।

ধর্ষণের পাশাপাশি পাল্লা দিয়ে বাড়ছে নারীপাচার। খাতায় কলমে নারীপাচারের বিরুদ্ধে আইন আছে, আইনরক্ষার জন্য রাজ্যে দেশে পুলিশ-প্রশাসন আছে। অথচ বাস্তবে তাদের ভূমিকা কী? তথ্য বলছে, প্রতি বছর দশ লক্ষেরও বেশি নারী পাচার হয় এ দেশে। এতেও শীর্ষে আছে পশ্চিমবঙ্গ। অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ২০১২ সালের একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন, ভারতের বুকে বছরে কুড়ি লক্ষ মহিলা হারিয়ে যায়। ২০১৬ সালে ৩৫৫৯ জন পাচার হয়েছে এই রাজ্যে। কাজ দেওয়ার নামে, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কত শত মেয়েকে যুক্ত করা হচ্ছে পতিতাবৃত্তিতে, ফুটে ওঠার আগেই ঝরে যাচ্ছে কত স্বপ্ন-আশা-আকাঙ্খার কুঁড়ি।

অস্ত্র এবং মাদক পাচারের পরেই বিশ্বের তৃতীয় লাভজনক ব্যবসা আজ নারীপাচার। মা-বোনেদের দেহ নিংড়ে মুনাফাখোর পুঁজিমালিকদের পকেট ভরানোর এই প্রথা কি মধ্যযুগীয় বর্বর ক্রীতদাসপ্রথার চেয়ে কোনও অংশে কম বীভৎস? অথচ একটি 'গণতান্ত্রিক' দেশে সরকার প্রচারিত 'উন্নয়ন'-এর চোখধাঁধানো আলোর পাশেই বইছে এই নিকষ অন্ধকারের চোরা স্রোত। যাবতীয় আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নারীপাচার শিশুপাচারের এই বাড়বাড়ন্ত ঘটছে কী করে? এর জন্য দায়ী প্রশাসনের অবহেলা, ঔদাসীন্য এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা, বহু ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসনের সাথে পাচারকারীদের গোপন আঁতাত।

ধর্ষণ-নারীপাচারের বাইরেও তালাক, পণপ্রথা সহ অসংখ্য কুপ্রথা এবং পারিবারিক হিংসার বলি হয়ে অজস্র নারী সুস্থ জীবনের বৃত্ত থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষার রিপোর্ট বলছে, ১৮-৪৯ বছর বয়সী মহিলাদের ৩০ শতাংশই ১৫ বছরের পর থেকে শারীরিক হিংসার শিকার হন। এমন রিপোর্ট-তথ্য-পরিসংখ্যান প্রায় প্রতিদিন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হওয়ার পরেও, নারী নির্যাতনের ভয়ানক ছবিটা চোখের সামনে বারবার উঠে আসা সত্ত্বেও সরকারি নেতা-মন্ত্রীরা এ বিষয়ে নীরব, বড়জোর কখনও ঘটনার অভিঘাত প্রবল গণবিক্ষোভ তৈরি করলে তারা দু-একটা দায়সারা বিবৃতি দিয়েই কাজ সারেন। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা বলছে, বহু নারী নির্যাতনের ঘটনায় অপরাধী ধরা পড়ে না, ধরা পড়লেও তার কঠোর শাস্তির জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হয় নির্যাতিতার পরিবারকে। অপরাধের প্রমাণ লোপাটের চেষ্টা, অপরাধী নেতা-মন্ত্রী-প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর নিকটজন হলে তার সাতখুন মাফ হয়ে যাওয়া, নির্যাতিতা এবং পরিবারকে অভিযোগ প্রত্যাহারের হুমকি দেওয়া এসব তো আছেই। এমনকি ধর্ষকের সমর্থনে ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা মিছিল করছেন বা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান খুনি ধর্ষককে আড়াল করার চেষ্টা করছেন— সাম্প্রতিত অতীতে এমন লজ্জাজনক নজিরও তৈরি হয়েছে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-নেতাজির দেশে। আসলে, দেশের মানুষের জীবনের আর পাঁচটা জ্বলন্ত সমস্যার মতোই নারী নির্যাতন নারী অবমাননার প্রশ্নটিও পুঁজিবাদী সমাজকাঠামোর সাথে যুক্ত। গদিতে বসার জন্য মানুষের সেবা করার, উন্নয়ন করার, নারীকে সুরক্ষা মর্যাদা দেওয়ার যত প্রতিশ্রুতিই শাসক দলগুলো দিক না কেন, এরা প্রত্যেকেই ভোটসর্বস্ব নোংরা রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, মানুষের মূল্য এদের কাছে শুধুমাত্র ভোটের অঙ্কে। মানুষকে লুটে মুনাফার পাহাড় বানানো একচেটিয়া পুঁজিমালিকদের পায়ে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েই এরা ক্ষমতায় আসে। এই ব্যবস্থার রক্ষক এই দলগুলো এবং তাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার কখনওই নারী নির্যাতন রুখতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারে না। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কর্মসংস্থানের বেহাল দশা থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার নৈতিক শক্তি এবং মেরুদণ্ড নষ্ট করে দিতে যুবসমাজকে অমানুষ বানানো এই মুনাফাসর্বস্ব ব্যবস্থার প্রয়োজন। তাই ড্রাগ-মদ-জুয়ার ঢালাও আয়োজন, ব্লু ফিল্ম-পর্নোগ্রাফির রমরমা, নারীদেহ নিয়ে কোটি টাকার ব্যবসা। একে রুখতে হলে একদিকে যেমন জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলে অপরাধীদের শাস্তি দিতে আইনি ব্যবস্থা নিতে সরকারকে বাধ্য করতে হবে, অন্যদিকে বুঝতে হবে, পুঁজিবাদের শোষণ লুণ্ঠন যত বাড়বে, এই পচাগলা সমাজ তত দীর্ঘমেয়াদি হবে, আরও বাড়বে মনুষ্যত্বের অবনমন এবং তার অনিবার্য পরিণতিতে বাড়তে থাকবে নারী নির্যাতন। যে সমাজ সমস্ত মানুষের বিকাশের অগ্রগতির যাবতীয় পথকে রুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমাজ কখনও নারীকে যথার্থ মর্যাদা বা মুক্তি দিতে পারে না। দরকার মূল্যবৃদ্ধি-বেকারি-দারিদ্রে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং রামমোহন-বিদ্যাসাগর-বেগম রোকেয়া-সাবিত্রীবাই ফুলে-র দেখানো পথে নিজেদের শিক্ষা ও চেতনার মান বাড়ানো। মনে রাখতে হবে, এই পুঁজিবাদী সমাজ উচ্ছেদের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়েই গড়ে উঠবে আজকের দিনে একটি যথার্থ প্রগতিশীল নারীমুক্তি আন্দোলন।

কোনও একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া চলে না

তিনের পাতার পর

মাধ্যমে। যদি আজ আমরা ইংরেজিকে ত্যাগ করি তা হলে উত্তর দক্ষিণে এই ভাষাগত আদান প্রদানের সম্পর্কটি শেষ হয়ে যাবে। অফিসিয়াল ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে না রাখলে দক্ষিণ ভারতের সাথে উত্তর ভারতের ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বই অসম্ভব হয়ে পড়বে। বর্তমানে বিজেপি কি ঐক্যবদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্বকে বিপন্ন করার সেই কাজটিই করতে চাইছে?

যাই হোক সেই বিতর্ক সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত একটি সমাধানসূত্র বের করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে সংবিধান প্রবর্তিত হওয়ার ১৫ বছর পর্যন্ত হিন্দির সাথে ইংরেজি যেমন সরকারি ভাষা ছিল তেমনই থাকবে। পরে পার্লামেন্ট ইংরেজির বিকল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তখনকার মতো বিষয়টিকে ধামাচাপা দিলেও হিন্দি বলয়ের প্রভাবশালী বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের স্বার্থে সারা দেশের উপর হিন্দি ভাষাকে চাপিয়ে দেওয়ার পরিকল্পিত ও ধারাবাহিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এরপর ১৯৫১ সালে ভাষা সুমারির সময় সরকারি তরফে একটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। প্রথম ভাষার সাথে দ্বিতীয় পছন্দের ভাষা হিসেবে সকলকে ইংরেজি এবং উর্দু বাদ দিয়ে একটি দেশীয় ভাষার উল্লেখ করতে বলা হয়। ফলে ভাষা-সুমারির কৌশলী পরিসংখ্যানে প্রথম ও দ্বিতীয় পছন্দের ভাষা হিসেবে হিন্দি সবার উপরে উঠে আসে। এর পর কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির পনের বছর অতিক্রান্ত হওয়ার ঠিক আগেই জওহরলাল নেহেরু সরকার আবার হিন্দিকে ইংরেজির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব আনে। দেশের অহিন্দিভাষী রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে এর বিরুদ্ধে পুনরায় প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে তামিলনাড়ুতে এমনকি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতির ঘটনা পর্যন্ত ঘটে। এবারও দেশব্যাপী প্রতিবাদের সামনে পিছু হটে শেষ পর্যন্ত সরকার তার প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়। পার্লামেন্টে 'অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্ট - ১৯৬৩' পাস হয়। হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজিকেও সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাজ্যগুলিকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এক বা একাধিক ভাষাকে রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার। নেহেরু দেশবাসীকে নিশ্চয়তা দিতে বাধ্য হন যে দেশের অহিন্দিভাষী মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দি ভাষাকে গ্রহণ করার ইচ্ছা না প্রকাশ করলে তাদের উপর হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

কাগজে-কলমে চাপিয়ে না দেওয়ার কথা বলা হলেও হিন্দি ভাষাকে জনপ্রিয় করে তুলবার জন্য নানা প্রকল্পে অঢেল আর্থিক বরাদ্দ করা, রেডিও টিভি সংবাদ মাধ্যম সিনেমা ধারাবাহিক ইত্যাদিকে কাজে লাগিয়ে, কংগ্রেস জনতা বিজেপি, যে দলেরই হোক কেন্দ্রীয় সরকার কখনো সরাসরি কখনো নানা কৌশলে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে যেতে থাকে। বর্তমান বিজেপি আরএসএস পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পর হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তান অ্যাজেন্ডা কার্যকর করার লক্ষ্যে এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত আগ্রাসী রূপ গ্রহণ করছে। ২০১৭ সালে বিজেপি আরএসএস নেতা তথা দেশের উপরাষ্ট্রপতি বেঙ্কাইয়া নাইডুর প্রকাশ্য একটি বক্তৃতায় হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা, ২০১৮ সালে মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক থেকে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত বিভাগের স্নাতক স্তরে হিন্দিকে অবশ্যপাঠ্য করার নির্দেশ পাঠানো, ২০১৯ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পক্ষ থেকে হিন্দিকে জাতীয় ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা, সম্প্রতি নবম শ্রেণি পর্যন্ত হিন্দিকে আবশ্যিক হিসেবে পড়ানোর নির্দেশ ইত্যাদি একের পর এক পদক্ষেপ তার দৃষ্টান্ত। এরই ধারাবাহিকতায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বর্তমান ঘোষণা।

সরকারি এই অতি তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দিভাষী আমজনতার কিছুটা নিস্পৃহ প্রতিক্রিয়া কিন্তু অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আসলে মূল্যবৃদ্ধি বেকারত্বের সমস্যা বা দুর্নীতি সারা দেশের মতো প্রতিটি হিন্দিভাষী মানুষেরও দৈনন্দিন জীবনের প্রধান সমস্যা। অন্য রাজ্যের মতো হিন্দি ভাষাভাষী ছাত্র উচ্চশিক্ষায়, গবেষণায়, মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ইনফরমেশন টেকনোলজি ইত্যাদিতে যারা পাঠরত কিংবা একটা উপযুক্ত কর্মসংস্থানের লক্ষ্য সামনে রেখে যাঁরা লড়াই করে যাচ্ছেন সেই সব যুবক, তাঁদের শিক্ষক-অভিভাবকরা সকলেই বাস্তবটা জানেন। তাঁরা ভাল করেই জানেন এসব ক্ষেত্রে হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজি না জানা থাকলে তাঁদের চলে না, ইংরেজি শিক্ষার থেকে দূরে সরিয়ে রাখলে তাঁদের বঞ্চিতই করা হবে। সরকার হিন্দির জন্য যত উত্তেজনাই তৈরি করার চেষ্টা করুক বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে ইংরেজির গুরুত্ব খাটো করার মধ্যে তাঁরা উৎসাহিত হওয়ার মতো কিছু পাচ্ছেন না।

ভারতের একটা বিরাট অংশের মানুষ ইংরেজিকে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনেকের মাতৃভাষাও ইংরেজি। শুধু তাই নয়, হিন্দি ভাষাকে যে কোনও উপায়ে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য নানা চেষ্টা সত্ত্বেও প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদেই আজও আমাদের দেশের সমস্ত আদালত, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, রাজ্য কিংবা কেন্দ্রের আইনসভাগুলির নথিপত্র ইংরেজিতেই লিখিত ও সংরক্ষিত হয়। দেশের রাজ্য সরকারগুলির এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মধ্যে নানা প্রশাসনিক নথিপত্রের আদান-প্রদানের ভাষাও অবশ্যই ইংরেজি। ইংরাজিকে ভারতীয় ভাষা হিসেবে মেনে নিয়েই আমাদের দেশের সাহিত্য অ্যাকাডেমি প্রতি বছর এই ভাষায় লিখিত ভারতীয় সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্মকে অ্যাকাডেমি পুরস্কারে পুরস্কৃত করে থাকে।

আশ্চর্যের কথা শুধু আজকের বিজেপি সরকারই নয়, স্বাধীন ভারতের সমস্ত শাসকরাই ইংরেজি বিদেশি ভাষা এই অজুহাত তুলে ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্মরণে না এসে পারে না যে, এখানেও সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রেও এর কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। নানা অজুহাতে ইংরেজি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তারাও কার্যকর করেছিল। প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার সর্বনাশা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় 'শিক্ষা সংকোচন বিরোধী ও স্বাধীকার রক্ষা কমিটি' গড়ে ওঠে। সুকুমার সেন, প্রমথনাথ বিশি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশীল মুখার্জীর মতো বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা এই আন্দোলনে অংশ নেন। দীর্ঘ দু'দশক ধরে লাগাতার আন্দেলানের চাপে সরকার তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কিন্তু ততদিনে এ রাজ্যে শিক্ষার সামগ্রিক মানের যে অবনমন ঘটেছিল তার প্রভাব এ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

আজ সারা বিশ্বের সাথে যোগাযোগের গ্রহণযোগ্য ভাষা হিসেবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে প্রবেশের মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রযুক্তির জগৎ ইংরেজি ছাড়া অচল। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ব্যাপক উন্নতির কারণে বাঙ্গালোরকে ভারতের আইটি ক্যাপিটাল বলা হয়, সেটা সম্ভব হয়েছে ইংরেজির কারণেই। ইংরেজির এই অপরিহার্য গুরুত্বের কথা চিন, জাপান, জার্মানির মতো উন্নত দেশগুলিও স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। অহিন্দি ভাষাভাষী মানুষ তো বটেই এমনকি হিন্দি ভাষাভাষী মানুষের কাছে ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা আসলে তাদের যথার্থ ক্ষমতায়ন থেকে, উন্নত চিন্তা ভাবনা শিক্ষার সুযোগ, বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ এবং উন্নত জীবন জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে রাখা। ভাষা আধিপত্যের উন্মাদনা তৈরি করে সরকার আসলে হিন্দিভাষী জনসাধারণকে অন্ধকারের দিকেই ঠেলে দিতে চাইছে

বেকারি আর দারিদ্রের তাড়নায় কাজের খোঁজে বিপুল সংখ্যক হিন্দিভাষী যুবককে ভিন রাজ্যে পাড়ি দিতে হয়। সেই ভিন রাজ্যের মানুষের সাথে অন্তত কাজের কথা আদান প্রদানের জন্য পরস্পরের ভাষা জানার চেষ্টা করতে হয়। অহিন্দি ভাষাভাষীরা হিন্দি বোঝার চেষ্টা করেন। হিন্দিভাষী বোঝার চেষ্টা করেন বাংলা, মালয়ালম বা অন্য কোনও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ভাষা। শ্রমজীবী মানুষের এই আদান-প্রদানের মধ্যে সাধারণভাবে কোনও রেষারেষির ব্যাপার থাকে না। ইংরেজির মতো একটি ভাষা জানা থাকলে উভয়েরই সুবিধা হয়, আবার নিজেদের ভাষায় আদানপ্রদান মাধ্যমে দু'জনে সমৃদ্ধ হন। কিন্তু সেই ভিন রাজ্যের মানুষদের 'হিন্দিতেই কথা বলতে হবে' এ রকম ফরমান জারি হলে এই স্বাভাবিক সম্পর্কের অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা। সাম্প্রতিক অতীতে মহারাষ্ট্রের মারাঠিভাষী কিছু মানুষের দ্বারা উত্তরপ্রদেশের হিন্দিভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ ও হেনস্থার ঘটনা এই ক্ষতিরই একটা জ্বলন্ত নিদর্শন। কাজেই, হিন্দি ভাষার সরকারি ফরমানের পর দক্ষিণ ভারতের মানুষের ক্ষোভের মধ্যে সঙ্গতভাবেই বিপদের সিঁদুরে মেঘ দেখছেন হিন্দি বলয়ের পরিযায়ী শ্রমিকরা। আর বিজেপি

আটের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

পুরুলিয়া জেলায় এসইউসিআই(সি)-র হুড়া লোকাল কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড বিনোদবিহারী মণ্ডল ৫ মে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর। তাঁর মৃত্যুসংবাদে কর্মী সহ এলাকার মানুষের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। মরদেহ লালপুরে দলের আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিয়ে আসা হলে সেখানে দলের কর্মীরা সহ বহু সাধারণ মানুষ অশ্রুজলে তাঁকে শেষবিদায় জানান।

কমরেড বিনোদবিহারী মণ্ডল শিক্ষকতা করার সুবাদে দলের তৎকালীন জেলা কমিটির সদস্য প্রয়াত কমরেড প্রভঞ্জন ভট্টাচার্যের মাধ্যমে দলের চিন্তার সাথে পরিচিত হন এবং কাজ শুরু করেন। দলের বক্তব্য প্রচারে তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, মানুষকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

পূর্বতন সিপিএম-ফ্রন্ট সরকারের আমলে পাশ-ফেল ও ইংরেজি চালুর দাবিতে, বাস-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধে, বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা আন্দোলনগুলিতে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেন। শিক্ষা আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষক সংগঠনের কাজ তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বলিষ্ঠতার সাথে করে গেছেন। বহু শিক্ষককে দলের কাজে যুক্ত করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদ পরিচালিত চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা পরিচালনাতে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর সাংস্কৃতিক মান ছিল উন্নত। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের বইপত্র তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন। নবজাগরণের মনীষীদের জীবনসংগ্রাম, পার্টির মুখপত্র, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা বইপত্র পড়তেন।

সাধারণ মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা, কর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন অভিভাবকের মতো। চরিত্রের মাধুর্যে সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারতেন। নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর আবেগময় সম্পর্ক ছিল। নবীন কর্মীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর পরিবার ও আত্মীয়দের দলের সাথে যুক্ত করার চেষ্টা করে গেছেন। দলের আঞ্চলিক কার্যালয় গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। অসুস্থ অবস্থায় গৃহবন্দি থাকাকালীন সময়েও দলের নেতা-কর্মী ও অন্যান্যদের নিয়মিত খোঁজখবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ সংগঠককে এবং খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ হারাল তাদের আপনজন ও প্রিয় এক নেতাকে।

২৬ মে লালপুরে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় তাঁর সংগ্রামী জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন দলের পুরুলিয়া জেলা সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য এবং দলের রাজ্য কমিটি ও বাঁকুড়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অসিত মণ্ডল।

কমরেড বিনোদবিহারী মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

বিক্ষোভ প্রশমনে রাজ্য প্রশাসনের তৎপরতা দরকার ছিল

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

হাওড়া জেলার সাম্প্রতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে এসইউসিআই(সি) রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১২ জুন এক বিবৃতিতে বলেন, ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্যকারী বিজেপির জাতীয় মুখপাত্রদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ হাওড়া জেলায় নানা ভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন যার জেরে জনজীবনের ব্যাঘাত ঘটেছে ও ধনসম্পত্তি নষ্ট হয়েছে। এক ধরনের মৌলবাদ অপর মৌলবাদকে শক্তিশালী করে। সে জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের তীব্র প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করে রাজ্য প্রশাসনের আরও তৎপরতার সাথে বিক্ষোভ প্রশমন করা দরকার ছিল। প্রতিবাদকারীদের কাছে আমাদের আবেদন, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ধারায় প্রকৃত বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালিত হোক।’

দলের হাওড়া সদর জেলা কমিটি ও হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১২ জুন হাওড়া মহকুমাশাসক ও জেলাশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি জানানো হয়— বিক্ষোভের ঘটনায় আহতদের উপযুক্ত চিকিৎসার দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। যাদের ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ধ্বংস হয়েছে তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। এই ধরনের ঘটনা আর যাতে কোথাও না ঘটে তার জন্য জেলা প্রশাসনকে উপযুক্ত সর্তকতামূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনের শপথ চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের সম্মেলনে

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ রুখতে ও সকলের জন্য স্বাস্থ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি নিয়ে ১১ জুন কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্রে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের কলকাতা জেলা সম্মেলনে যোগ দিলেন তিন শতাধিক চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী, মেডিকেল ছাত্র সহ স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ। উপস্থিত হয়েছিলেন বহু প্রথিতযশা চিকিৎসক, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ সুকুমার মুখার্জি, ডাঃ অলোকেন্দু ঘোষ, ডাঃ অশোক সামন্ত ও ডাঃ তরুণ মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়া ভিডিওতে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠান প্রথিতযশা বর্ষীয়ান চিকিৎসক ডাঃ কান্তিভূষণ বক্সী ও ডাঃ অধ্যাপক অসীম রায়চৌধুরী।

সম্মেলনে বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ পার্থসারথি মণ্ডলকে সভাপতি এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ নীলরতন নাইয়াকে সম্পাদক নির্বাচিত করে ১০৮ জনের কলকাতা জেলা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ভবিষ্যতে মেডিকেল এথিক্সের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মেডিকেল ক্যাম্প চালানোর পাশাপাশি স্বাস্থ্যের উপর যে কোনও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করে।

কারখানায় আগুন, অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি

হাওড়ার শালিমার বার্জার রঙ কারখানায় কর্তৃপক্ষের সীমাহীন গাফিলতিতে যেভাবে ২২ জন কর্মী গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে আছে, সেই ঘটনায় অভিযুক্তদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে এআইইউটিইউসি হাওড়া জেলা কমিটি। স্থানীয় মানুষেরা যেভাবে কারখানার অগ্নিদগ্ধ কর্মীদের হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন তার জন্য কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের অভিনন্দন জানানো হয়েছে। পাঁচ বছর আগে এই কারখানায় আরও একবার আগুন লেগেছিল। তা সত্ত্বেও কারখানা কর্তৃপক্ষ অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাটিকে গুরুত্ব দিয়ে সচল রাখেনি। ব্যবস্থাটি ঠিক ভাবে কাজ করলে এই দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। তাই কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের দমকল দপ্তর এই দুর্ঘটনার দায় কোনওভাবেই এড়াতে পারে না। এআইইউটিইউসি হাওড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে— আগুনে দগ্ধ সমস্ত কর্মীর চিকিৎসার দায়িত্ব কারখানা কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, শ্রমিক সুরক্ষায় গাফিলতির জন্য দায়ী কারখানা কর্তৃপক্ষ এবং দমকল দপ্তরের আধিকারিকদের শাস্তি দিতে হবে, সমস্ত কারখানায় যাতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সচল থাকে সে ব্যাপারে দমকল দপ্তরের নজরদারি নিশ্চিত করতে হবে।

কোনও একটি ভাষা চাপিয়ে দেওয়া চলে না

সাতের পাতার পর

দেখছে তার ভোট রাজনীতির স্বার্থ।

আমাদের দেশে বেকার সমস্যার প্রবল চাপে কোটি কোটি যুবক কাজের সন্ধানে সারা দেশে ঘুরে বেড়ান এ কথা সকলের জানা। ২০১১ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের তরফে প্রায় ৯০ লক্ষ দূরপাল্লার যাত্রী, যারা ২০০ কিমির বেশি দূরত্ব কাজের খোঁজে অসংরক্ষিত কামরায় চড়ে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাতায়াত করেছেন, তাদের উপর একটি সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে কাজের খোঁজে যেসব রাজ্য থেকে বাইরে যাওয়ার (নেট আউট মাইগ্রেশন) সংখ্যা অন্য রাজ্য থেকে আসার সংখ্যায় (নেট ইন মাইগ্রেশন) তুলনায় অনেক বেশি সেই রাজ্যগুলি সাধারণভাবে অ-হিন্দিভাষী, বহুভাষাভাষী কিংবা হিন্দিভাষী জনসংখ্যা সেখানে ৫০ শতাংশের কম। উদাহরণ তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, পাঞ্জাব ও দিল্লি। উল্টো দিক থেকে যেসব রাজ্যে নেট ইন মাইগ্রেশনের তুলনায় নেট আউট মাইগ্রেশনের সংখ্যা অনেক বেশি অর্থাৎ যে সব রাজ্যে যুবকরা কাজের খোঁজে বাইরে থেকে আসার তুলনায় দলে দলে ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে ট্রেনের অসংরক্ষিত কামরায় চড়ে অশেষ কষ্ট সহ্য করে শত শত কোথাও হাজার মাইল পাড়ি দিচ্ছেন কিন্তু বাইরে থেকে আসা কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা কম সেই রাজ্যগুলি হল উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ছত্তিশগড় ইত্যাদি হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্য। দেখা যাচ্ছে হিন্দি ভাষাভাষীর সংখ্যা যেখানে যত বেশি, পরিযায়ী শ্রমিকদের অন্য রাজ্য থেকে আসার তুলনায় কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়ার সংখ্যা সেই রাজ্যে তত বেশি। অর্থাৎ শুধুমাত্র হিন্দিভাষী হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট হিন্দি ভাষাভাষী রাজ্যগুলির মানুষ শিক্ষাদীক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থা জীবনযাত্রার মান কর্মসংস্থানের সুযোগ কোনওদিক থেকেই লাভবান হতে পেরেছেন এমন প্রমাণ কোথাও নেই।

জাতীয় ঐক্যের ধুয়া তুললেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর লক্ষ্য যে নির্বাচনী রাজনীতি এবং ক্ষমতায় টিকে থাকা এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। হিন্দি ভাষাকে একমাত্র সরকারি ভাষা ঘোষণা করা কিংবা দেশের সকল মানুষকে হিন্দি বলতে বাধ্য করার দ্বারা তারা আসলে হিন্দি বলয়ের ভোটব্যাঙ্ককে আরও শক্তপোক্ত করতে চাইছেন। ২০২৪-এর গোড়ায় দেশের সাধারণ নির্বাচন। এরই মধ্যে গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ইত্যাদি হিন্দি বলয়ের প্রধান প্রধান কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনও আছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার মনে করছে যে এই প্রস্তাবের দ্বারা হিন্দি ভাষাভাষী এলাকার মানুষের ব্যাপক সমর্থন পাওয়া যাবে। ধর্মের মতো এবার ভাষার প্রশ্নে বিভাজন ও তীব্র মেরুকরণ তৈরি করে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার করবেন। বোঝানো হচ্ছে যে এর দ্বারা হিন্দি ভাষাভাষী মানুষকে আর ইংরেজি বা অন্য কোনও ভাষা শিখতে হবে না। চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে তারা অহিন্দিভাষীদের থেকে এক পা এগিয়ে থাকবেন। এর সাথে উস্কানি দেওয়া হচ্ছে হিন্দিভাষী বৃহৎ জাতিসুলভ গর্ববোধে বা জাতিদম্ভে।

যদিও মূল্যবৃদ্ধি বেকারি আর রাজনৈতিক নেতাদের ভণ্ডামি ও সীমাহীন দুর্নীতিতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে এই উস্কানি তেমন কোনও উন্মাদনা তৈরি করতে পারছে এমন নয়। এমনকী হিন্দিভাষীদের কোনও অতিরিক্ত উৎসাহ-উদ্দীপনাও কিন্তু চোখে পড়েনি। দেশের সমস্ত মানুষ হিন্দিতে কথা বলতে বাধ্য হলে বর্তমানে যারা হিন্দিভাষী সেইসব মানুষের একটা মস্ত উপকার হবে এ কথা আপাতত মনে করছেন না হিন্দিভাষী আমজনতাও। তাই বলে বিজেপি রণে ভঙ্গ দেবে এমন আশা করা বাতুলতা মাত্র। তাদের অ্যাজেন্ডাকে তারা সামনে আনতেই থাকবে নানা বিরোধ, অজুহাত, কুযুক্তি বিভেদ আর বিদ্বেষের বিষকে হাতিয়ার করে। নির্বাচনী দাবা খেলায় কিস্তিমাত করার উদ্দেশ্যে মানুষের জীবনের আসল সমস্যাগুলি থেকে নজর ঘুরিয়ে দেওয়া এবং শোষিত মানুষের মধ্যে বিভাজন ও মেরুকরণ তৈরির এ-ও আর একটা চাল।

আচার্য হোন শিক্ষাবিদ

একের পাতার পর

গ্রীষ্মের ছুটি আরও ১১ দিন বাড়িয়ে স্কুলের পঠনপাঠন বন্ধ রাখার রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত ছাত্র স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সেখানে বলা হয় ‘আবহাওয়া দপ্তর যখন সুস্পষ্টভাবে পূর্বাভাস দিয়েছে যে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বর্ষা আসছে ১৬ জুন, তখন সেই দিন থেকেই ছুটি ঘোষণা করা মুখ্যমন্ত্রীর খামখেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর এই খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের চরম মূল্য ছাত্রছাত্রীদের দিতে হবে।

দূষণ প্রতিরোধে পদযাত্রা

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ছাইজনিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বাঁপুর খালে দূষিত জল ফেলা বন্ধ করে খাল বর্ষার আগে সংস্কার সহ ১১ দফা দাবিতে ‘কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটি’র উদ্যোগে সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মেচেদা শহর পরিক্রমা করে। কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের গেটে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগীরা এবং এক প্রতিনিধি দল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে দূষণ প্রতিরোধে ১১ দফা প্রস্তাবে স্মারকলিপি দেন।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৯৪৩৩৪৫১৯৯৮, ৯৪৩২৮৮৯৩৪৭ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com